সৃজনশীল বাংলাদেশ

সকলের জন্য সঙ্গীত
সকলের জন্য সংস্কৃতি

'শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ'
গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় সঙ্গীত
এবং
বাংলা সঙ্গীত-সংস্কৃতি শিক্ষণ কর্মসূচি

জাতীয় সঙ্গীত

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে
ও মা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায়রে– ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি–
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন –
ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি।
সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় সঙ্গীত

ক) জাতীয় সঙ্গীত কী?

জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে রাষ্ট্রকর্তৃক জাতীয়ভাবে নির্ধারিত একটি সঙ্গীত, যেখানে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, দেশের সৌন্দর্য ও গৌরবগাঁথার বর্ণনা থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে এই সঙ্গীতটি সমবেতভাবে পরিবেশিত হয়। সকল দেশেই জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বা যন্ত্রে বাজানোর একটি নির্দিষ্ট রীতি রয়েছে। জাতীয় সঙ্গীতের অপমান দন্ডনীয় অপরাধ। দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের একটি অনন্য সুন্দর রীতি হচ্ছে জাতীয় সঙ্গীত। পৃথিবীর সকল সভ্যসমাজই নিজ

দেশের প্রতি ভালোবাসা ও নিজ দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যকে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অন্যের কাছে তুলে ধরে। আমরাও এর ব্যতিক্রম নই।

বস্তুতপক্ষে মানুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে দেশের আলো-বাতাসেই সে বেড়ে ওঠে, সে দেশের রীতিনীতি, জীবনাচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস, বিশ্বাস, শিক্ষাদীক্ষা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি তাকে গড়ে তোলে। এ সব কারণেই সহজাতভাবে সে দেশ তার প্রিয় হয়ে ওঠে। দেশ হয়ে ওঠে তার আবেগের বিষয়, জড়িয়ে যায় অস্থিমজ্জার সঙ্গে এবং পরিণামে দেশই হয়ে যায় তার জীবন, তার পৃথিবী। প্রত্যেকটি মানুষের কাছেই তার দেশ সবচেয়ে সুন্দর, তার দেশ তার গর্বের, তার অহঙ্কারের।

খ) বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত: ইতিহাস

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান কবি শুধু কবি হিসেবেই সম্মানিত নন, তিনি বিশ্বের অন্যতম সঙ্গীতস্রষ্টা।

কোন কোন সমালোচক মনে করেন, পৃথিবীর পাঁচজন সঙ্গীতস্রষ্টার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একজন। তাঁর গানের বাণী ও সুর দুটোই অসাধারণ।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ পৈতৃক জমিদারি দেখার কাজে নিয়োজিত থাকার সময় (১৮৮৯–১৯০১) পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ ও শাহজাদপুরে আসেন। এই অঞ্চলের বিশেষত কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউল গানের বাণী ও সুর তাঁকে আকৃষ্ট করে। শিলাইদহের ডাক পিয়ন গগন হরকরা রচিত 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যেরে' গানটির সুরের অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।

এ গানটি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলনের গান।
১৯০৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।
১৯০৭ সালে প্রথম গাওয়া হয় বঙ্গভঙ্গবিরোধী মিছিলে।

আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হওয়ার ইতিহাস:

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয় গান ছিলো এই গানটি। বিভিন্ন সময় তিনি এই গানটির উল্লেখ করেছেন।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ গঠিত হয় স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ। ৩ মার্চ পল্টন মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভা শেষে ঘোষিত ইশতেহারে এই গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে এই গান প্রথম জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হয়।

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে গানটির প্রথম ১০টি চরণ রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পকে অংশ নেয়া ২০৫টি দেশের জাতীয় সঙ্গীতের তুলনামূলক বিচারে দৈনিক গার্ডিয়ান পত্রিকার মতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত দ্বিতীয় স্থান অর্জনের গৌরব অর্জন করে।

২০১৪ সালে ২, ৫৪, ৫৩৭ জন একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীতটি গেয়ে বাঙালি গিনেস বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করে।

গ) উপলব্ধিজাত কথা:

আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে দেশকে মা হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। উনিশ শতকে ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির কল্যাণে-অনুসরণে আমাদের কবি সাহিত্যিকগণ প্রথম দেশকে মা বলে সম্বোধন করা শুরু করেন এবং ভালোবাসার অঞ্জন মিশিয়ে দেশের মানুষ ও প্রকৃতিকে দেখতে শুরু করেন। মা যেমন আশ্রয় দেন, অন্ন বস্ত্র দেন-এই দেশও আমাদের অন্ন-বস্ত্র দেয়, আলো বাতাস দেয়। জন্মের পর প্রথমেই স্পর্শ করি দেশের মাটি। তারপর বেড়ে উঠি তারই বুকে। দেশের মাটিই আমাদের আশ্রয়। দেশ তাই আসলে মায়ের মতোই সকলসহা, সকলবহা। নিজের দেশকে নিজের মায়ের মতো ভালোবাসার ধারণাটি আমাদের ইতিহাসে স্বদেশপ্রেম জাগরণের একটি সূচনালগ্ন।

এ গানটি গাওয়ার সময় বাংলার রূপপ্রকৃতির অসংখ্য ছবি আমাদের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। কিছু ছবি গানে বর্ণিত হয়েছে। যেমন 'ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে' আর অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি, আমি কী দেখেছি মধুর হাসি' ইত্যাদি কিন্তু আরো অনেক ছবি একটি ছবির সূত্র ধরে আমাদের মানসপটে উপস্থিত হয়, আমাদের নিয়ে যায় আমাদের শেকড়ে। গানটি গাইতে গাইতে একের পর এক দেশের ছবি চোখের সামনে আসতে থাকে-আসতে থাকে সবুজ শ্যামল বাংলার ঐশ্বর্য, তার কোমলতা, তার স্নিগ্ধতা, তার মাঠ-ঘাট, তার সাগর-নদী, ফুল-ফল, গাছ-গাছালি, পাখি, আকাশ, বাতাস আর মায়ের ভালোবাসা, মায়ের মুখ–যার সবটা বাণীতে নেই। কিন্তু মানসলোকে উঁকি দিতে থাকে। মানসলোকে কল্পনার এই তরঙ্গসৃষ্টি, ছবির পর ছবি অঙ্কন, তা একজন বড় মাপের কবির সৃষ্টির একটি বৈশিষ্ট্য। সুরের সহজ চলনে, সাবলীল গতিছন্দে সুর, তাল, লয়-সব ছাড়িয়ে স্বদেশের একটি কোমল ঘনীভূত আবেগ আমাদের এই জাতীয় সঙ্গীত।

বাংলামায়ের এই রূপ আমাদের হৃদয়ে প্রেম জাগায়। এই প্রেমের আবেগে আমার দেশ অপূর্ব সুন্দরে পরিণত হয়। আর এই প্রেমই দেশের প্রতি মায়া ও অধিকার তৈরি করে। এ গান দেশকে দেখতে বলে। দেশকে দেখায় নতুন করে। আর দেখলেই দেশের সৌন্দর্য চোখে পড়ে, তার সমৃদ্ধি অনুভূত হয়। দেশের জন্য আবেগ জাগে। দেশকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। দেশ হয়ে ওঠে জননীর প্রতিমূর্তি।

গানের সঞ্চারিতে রবীন্দ্রনাথ বাণী ও সুরে এক অভিনব ভাবের সৃষ্টি করেছেন। এ গানের সঞ্চারির কথা আমাদের আবেগকে আপ্লুত করে। বটের ছায়া, নদীর কূলকূল ধ্বনি, অরূপ শোভা, অশেষ মায়া-মমতা এসব দেশের শান্ত সমাহিত ভাবটি প্রতিষ্ঠা করে। সুরটি রবীন্দ্রনাথের নয়- এ কথা আগেই বলেছি। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সুরটি কথার কারণে নবজন্ম লাভ করেছে। সঞ্চারিতে সুর নিচে নেমে গিয়ে কোমল ণ এর ব্যবহার আবেগকে যেন অসাধারণ এক ব্যঞ্জনায় অভিসিক্ত করেছে। দেশের সৌন্দর্যে পারিপাট্যে, ছায়ায়-মায়ায় আমাদের মন ভিজে যায়। দেশ আমাদের প্রাণের সামগ্রী হয়ে ওঠে। দেশ সীমাবদ্ধ থাকে না শুধু মাটি আর প্রকৃতির মধ্যে বা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে। দেশ হয়ে যায় আমাদের মানসলোকের সৃষ্টি। সঞ্চারির কথার সঙ্গে সুরের সংশ্লেষে দেশপ্রীতির সমস্ত আবেগ যেন উথলে উঠেছে। কথা সুরের আবেগকে যেন সম্মোহিত করেছে– কথা যেন দ্যোতিত হয়েছে সুরসৌন্দর্যের নতুনমাত্রায়। এ এমন এক অনুভূতি যা না গাইলে বোঝা যায় না।

কেউ কেউ বলেন, দেশটি চূড়ান্ত অর্থে তরুণদের। কারণ তরুণরাই সমগ্র পৃথিবীতেই স্ব স্ব দেশের স্বাধীনতা এনেছে। প্রকৃতঅর্থে তরুণরাই সত্য উপলব্ধি করতে পারে এবং সত্যের জন্য জীবন দিতে পারে। আমাদের দেশেও যারা একাত্তরে প্রাণ দিয়েছে- তার সিংহভাগই তরুণ। আর তরুণরাই রক্ষা করবে স্বাধীনতা। এ জন্যে তরুণদেরই বোঝতে হবে দেশকে। দেশ না থাকলে কী হয়-আমাদের নিকটস্থ মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। হাজারে হাজারে মরছে বা বিকলাঙ্গ হচ্ছে, লাখে লাখে নিজের সাজানো সংসার ফেলে সাগরনদী পাড়ি দিয়ে, পুলিশের পিটুনি সয়ে শরণার্থী হচ্ছে। সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশ কি সহসা দাঁড়াতে পারবে? বস্তুত সকল যুগে সকল কালেই দেশবিরোধী লোক থাকে, দল থাকে-চটকদার বা বিভিন্ন ধর্মের লেবাসে শুধু দেশবিরোধী নয়, মানবতাবিরোধী তত্ত্বওয়ালা মানুষরূপী শয়তান থাকে। তরুণদের উচিত হবে, জ্ঞানচক্ষু দিয়ে সত্য উপলব্ধি করা। ৩০ লক্ষ শহীদ ও ৫ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম হারোনোর বিনিময়ে যে স্বাধীনতা, আজ আমরা তার সুফল ভোগ করছি। জীবনদান সহজ নয়। জীবনদান সত্যিই কঠিন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা জীবন দিয়েছেন দেশের জন্য-দেশের মানুষের জন্য। এটা চোখ বন্ধ করে উপলব্ধি করতে হবে। কোন কোন মনীষী বলেন, মানুষের হৃদয় থেকেই জন্ম নেয় একটি জাতির; আর মানুষ হৃদয় দিয়েই অনুভব করে দেশের অস্তিত্ব–গড়ে তুলে

তিলে তিলে দেশকে আবেগ ও ভালোবাসা দিয়ে। এ কারণেই দেশ মানসিক–শুধু একটি মানচিত্র নয় বা ভূখণ্ড নয়। আমরা পরাধীন ছিলাম। একবার বিট্রিশদের, পরে পাকিস্তানিদের। দাসত্বের অপমানবোধ কেমন-তা আজ আমাদের পক্ষে কল্পনা বা অনুমান করাও কঠিন। আমাদের ঘরে ভাত ছিলো না, পরনে কাপড় ছিলো না, চিকিৎসা ছিলো না, প্রয়োজনীয় স্কুল কলেজ ছিলো না। প্রতিবছর কার্তিক অগ্রহায়ণে না খেয়ে মারা যেতো হাজারে হাজার। এটাই সত্য। ইতিহাস ও সাহিত্য পড়লে এই সত্য তোমরা দেখবে, আশ্চর্য হয়ে যাবে। ঔপনিবেশিক শক্তি আমাদের 'দাবায়ে' রেখেছিলো। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা আমরা পেলাম, তার ফলে আমরা আলো পেয়েছি। বর্তমানে একটা পর্যায়ে এসেছি। আমাদের আরো পথ পাড়ি দিতে হবে। এ দেশকে রক্ষা করা ও এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব তরুণদের। অস্থির এই পৃথিবীতে কেবল তোমাদের দেশপ্রেমই তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের নিরুদ্বিগ্ন করতে পারে।

এ দেশ বিভিন্নভাবে আজো আক্রান্ত হচ্ছে। সব আক্রমণ দেখা যায় না। সব আঘাত বা আক্রমণ তাড়াতাড়ি পরিমাপও করা যায় না। দেশের সঙ্কট মায়ের সঙ্কট, অস্তিত্বের সঙ্কট। এ সত্য আমাদের বোঝতে হবে। এ জন্যেই মায়ের মুখখানি মলিন হলে আমরা নয়নজলে ভাসি। মা, মাটি ও দেশ সমান্তরাল। দেশকে ভালো না বাসার মতো মূর্খতা আর নেই। দেশের অমঙ্গল কামনা-প্রচেষ্টা জঘন্যতম ঘৃণার কাজ। দেশপ্রেমকে আমাদের নবী ঈমানের অঙ্গ বলেছেন। দেশকে ভালো না বাসলে তার প্রতি মমত্ববোধ জাগে না, তার জন্য কাজ করা যায় না। প্রকৃত অর্থে আমাদের দেশ শুধু আমাদের নয়–আমাদের পরবর্তী প্রজন্মেরও। আমাদের ভাবনা ও কাজের ওপর নির্ভর করে পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের জন্য এ সরল সত্যটুকু বোঝা আমাদের জরুরি। আমরা সোনার বাংলা গড়তে চাই, সোনার বাংলাকে ভালোবেসে। আমাদের সোনার বাংলা হবে সকলের। এ দেশ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান- সকলের। যারা জন্মেছে এদেশে-সকলেরই এ দেশ। তবে শুধু জন্মগ্রহণ করলেই কেউ দেশের হয় না। যারা দেশকে প্রেম দিয়ে, সেবা দিয়ে নিজের করে নেয়, দেশ প্রকৃতঅর্থেই তারই হয়। সকলের প্রচেষ্টায় এই সোনার বাংলা হবে মর্যাদার তীর্থস্থান।

ভাষার গান

গীতিকার: আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
সুরকার: শহীদ আলতাফ মাহমুদ

আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি,
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

জাগো নাগিনীরা জাগো, জাগো নাগিনীরা জাগো, জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রুখে মানুষের দাবী
দিন বদলের ক্রান্তিলগ্নে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো:

লেখক ও সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী ১৯৫২ সালের একুশে ফ্রেবুয়ারিতে এই গানটি লেখেন।

প্রথমে আবদুল লতিফ এবং পরে আলতাফ মাহমুদ গানটি সুর দেন। আলতাফ মাহমুদের সুরটি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং পরবর্তী সময়ে এই সুরটিই গানটির প্রাতিষ্ঠানিক সুর হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৫৪ সালের প্রভাতফেরিতে প্রথম আলতাফ মাহমুদের সুরে গানটি গাওয়া হয়।

ইতিহাস/রচনার প্রেক্ষাপট:

আমরা সকলেই জানি, ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পূর্ব বাঙলা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পাকিস্তানের অংশ হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

কিন্তু প্রথমেই পাকিস্তানিরা ভারতবিভাজনের সময় নতুন পাকিস্তান যে যুক্তরাজ্য (এখন ভারত যে রকম আছে)হবে অর্থাৎ পাকিস্তানের সব ক'টি প্রদেশ যে আলাদা এবং স্বায়ত্তশাসিত হবে-এই চুক্তি অস্বীকার করে।

১৯৪৮ সালে, অর্থাৎ তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মাথায় পাকিস্তানের জাতির জনক মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ঢাকা এসে কার্জন হলের একটি অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন: নতুন এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এবং উর্দু। চিরকালের নিরীহ শান্ত বাঙালি সাথে সাথে জবাব দিলো: না, না, উর্দু রাষ্ট্রভাষা মানি না। আমরা বাঙালি, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।

সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ভাষা বাংলা। সুতরাং বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। পাকিস্তানিরা যুক্তি মানে না। ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই আমাদের বিবেচনা করে এবং সে রকম আচরণেই লিপ্ত হয়। পাকিস্তানিরা বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করতে থাকে। সকল ক্ষেত্রেই তারা আমাদের বঞ্চিত করতে শুরু করে। সকল ক্ষমতাই তারা প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে দখল করে নেয়। আমরা বোঝতে শুরু করি তাদের প্রতারণা।

আমরাও ধীরে ধীরে শক্ত অবস্থানে উপনীত হই। ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১- এ কয়েকটি বছর ভাষার প্রশ্নে দেনদরবার হয়েছে। ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে। সে ইতিহাস লম্বা, এখানে উল্লেখ করার মতো নয়। '৫২ সালে ঢাকায় রাষ্ট্রভাষার দাবীতে যে মিছিল বেরোয়, তাতে পাকিস্তানিরা গুলি করে। শহিদ হয় আমাদের সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার। অনভিপ্রেত এই হত্যাকাণ্ডে আমরা চেতনারহিত হই, সম্ভিত হয়ে পড়ি।

'মুসলমান মুসলমানের ভাই' বলে যে একাত্ম হয়েছিলাম, তা আর রইল না। ভাই হলে তো ভাইয়ের বুকে গুলি চালাতে পারে না। ওরা যে আলাদা এবং ওরা যে মানুষ নয়- আমরা বোঝলাম। এই উপলব্ধির প্রকাশ থেকেই গানটির সৃষ্টি।

১৯৫২ সালের ২১ শে ফ্রেব্রুয়ারি আবদুল গাফফার ঢাকা মেডিকেল কলেজে যান আহতদের দেখতে। মেডিকেলের আউটডোরে মাথার খুলি উড়ে যাওয়া একটি লাশ তিনি দেখতে পান। লাশটি দেখে মনে হলো, এ যেন তার নিজের ভাইয়ের রক্তমাখা লাশ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রথম দুই লাইন লিখেন। পরে তিনি কয়েকদিনে গানটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম প্রকাশিত লিফলেটে এই গানটি 'একুশের গান'শিরোনামে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে সংকলনে' এ গানটি স্থান লাভ করে।

১৯৬৯ সালে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান তাঁর 'জীবন থেকে নেওয়া' ছবিতে

এ গানটি সংযোজন করেন এবং নতুন মাত্রা পায় ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেলে এ গানটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হলে ভিন্ন একটি মর্যাদার আসন লাভ করে। ২০০৬ সালে বিবিসির শ্রোতা জরিপে বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ গানের তালিকায় এ গানটি তৃতীয় স্থান লাভ করে।

যা বলা প্রয়োজন:

বাঙালি ও বাঙলা ভাষার ইতিহাসে এ গানটি একটি ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালের স্বাক্ষর বহন করে। নিজের ভাষার জন্য, নিজের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়ের জন্য জীবন দেয়ার দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। আর বাঙালির ইতিহাসে বাঙালি প্রথম ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করছে নবজীবন ও নবযুগের সূচনা। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, বাঙালির জীবনে খুব একটা প্রতিবাদ নেই, সে শান্ত, নিরীহ, অচঞ্চল। বারে বার মার খেয়েছে, অত্যাচার সয়েছে-রুখে দাঁড়ায়নি। কিন্তু এবার প্রথম, খাদ্য বা বস্ত্রের জন্য নয়, চিকিৎসা বা বাসস্থানের জন্যও নয়–ভাষার জন্য প্রতিবাদী হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং বাধার মুখে জ্বলে উঠেছে।

বায়ান্নোর এই আন্দোলনটি ছিলো সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আমাদের সংস্কৃতিকে তারা ধ্বংস করতে চেয়েছিলো। কারণ কোন দেশের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করলেই সে দেশকে করতলগত করা সম্ভব। কখনো ইসলাম ধর্মের নামে, কখনো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অলীক স্বপ্নে তারা আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা দেয়, বিকৃত করে উপস্থাপন করে। আমরা পাকিস্তানিদের সাম্রাজ্যবাদী নগ্ন আক্রমণের স্বরূপ বোঝতে লাগলাম। আমরা হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতিকে ত্যাগ করতে অস্বীকার করলাম। মায়ের ভাষাকে মায়ের মতোই আপন জেনে জড়িয়ে ধরলাম প্রচণ্ড আবেগ ও ভালোবাসা দিয়ে। ওরা আমাদের ছাড় দেয়নি। ওরা সামনে চলে আসে। আমরা এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনটিকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে উপনীত হলাম রাজনৈতিক আন্দোলনে। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে একুশের প্রভাব কল্পনাতীত প্রভাব বিস্তার করে এবং মুসলিম লীগের রাজনীতি বন্ধ হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে এই সংগ্রামকে কেন্দ্র করেই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং শেষে একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করা হলো। এ কারণেই আমরা বলি: একুশের পথ বেয়েই আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সংগ্রাম। আমরা আরো বলি: একুশ আমাদের শেকড়। একুশ আমাদের অস্তিত্ব। একুশ মানে মাথা নত না করা।

আরো একটি কথা:

'৪৭ সালে আমরা পাকিস্তান তৈরি করে একত্রিত হয়েছিলাম ধর্মের ভিত্তিতে। আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি ছিলো ধর্ম। যে যে গোত্রের বা বর্ণেরই হই না কেন, ধর্ম এক হলেই একসাথে মিলে আমরা নির্মাণ করবো নতুন জাতি-মুসলমান

জাতি। ধর্মকে ভিত্তি করে মিলানোর চেষ্টা ছিলো সেটি। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের পর আমরা বোঝলাম, দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল। ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তা নির্ধারণ যথার্থ ছিলো না। আমরা নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালি। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যেমন বলেছেন যে, আমাদের চেহারা, আকৃতি, জীবনাচরণ ইত্যাদিতে বাঙালিত্বের ছাপ স্পষ্ট এবং স্রষ্টাপ্রদত্ত, যাকে কোন কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিকে আমাদের পরিচয় নিয়ে সঙ্কট ছিলো: আমরা 'মুসলমান বাঙালি' না 'বাঙালি মুসলমান'? ভাষা আন্দোলনের পর আমরা স্পষ্ট করলাম: বাঙালিত্ব জন্মগত, আল্লাহ প্রদত্ত। বাঙালিত্ব হাজার বছরের। আমরা ধর্ম পরিবর্তন করতে পারি। এ অঞ্চলের যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলামান, তা আগে ছিলো না। আমরা ধর্মান্তরিত হয়েছি। কেউ হিন্দু থেকে, কেউ বৌদ্ধ থেকে বা অন্য কোন ধর্ম থেকে। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তথা বাঙালিত্ব যা আছে, তা রয়ে গিয়েছে এবং তা থাকবে। তার পরিবর্তন করতে পারি না। ধর্ম পরিবর্তন করতে পারি। সুতরাং আগে আমি বাঙালি, পরে আমি হিন্দু বা মুসলিম, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান ইত্যাদি। এ চেতনার বিকশিত রূপই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। 'নিরপেক্ষ 'আর' হীনতা' শব্দের অর্থ এক নয়। যে যার ধর্ম, তা পালন করার স্বাধীনতার নামই ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার।

ভাষা আন্দোলনের পর বাঙালি- যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি, আমরা একত্রিত হলাম। হোক আমাদের ধর্ম ভিন্ন। তাই নতুন করে ভাষাকে ভিত্তি করে আমরা নির্মাণ করলাম আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি। বাঙালি হিসেবে আমাদের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য আছে, মানুষ হিসেবে মানুষকে গ্রহণ করার। পলিমাটির পলির দেশে বেড়ে ওঠা আমাদের মন পলিমাটির মতোই নরম। আমরা কোনক্রমেই হানাহানিতে বিশ্বাসী নই। আমরা অসাম্প্রদায়িক। পাঞ্জাবি, বিহারি বা বেলুচদের মতো উগ্র নই। ওদের মতো কথায় কথায় ছুরি বা বন্দুক নিয়ে বের হয়ে যাই না। হিংসা বা নিন্দাকে বংশ পরম্পরা জিয়িয়ে রাখি না। আমাদের এ দেশ বাউল, সুফির। ধর্মের কোমল ও মার্জিত রূপটিই এ দেশে প্রতিষ্ঠিত। আমরা কখনোই কোন কারণেই উগ্রতা প্রশয় দেই না। আমরা সহনশীল। তাই আমরা এই হত্যাকাণ্ডের পর তাদের প্রতি ঘৃণাই ছুঁড়ে দিলাম না, তাদের সঙ্গে যে আমাদের পথচলা সম্ভব নয়–তা বোঝে গেলাম।

পরবর্তী ইতিহাস আমাদের জানা। আমরা এক সাগর রক্ত দিয়ে তাদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়ে আনি।

গানটির কথা ও সুর:

গানটির কথা সাধারণ কিন্তু তরঙ্গবহুল। আগেই বলেছি, এটি ইতিহাসের স্বাক্ষী। আর এ গানের সুরকার আলতাফ মাহমুদ অনেক দেশাত্মবোধক গানের সুরস্রষ্টা। দেশ ও দেশের মানুষ তাঁর সৃষ্টির কেন্দ্রে অবস্থিত। পাকিস্তানিদের চোখে তিনি অপরাধীই

ছিলেন। অমর একুশের গানটিতে তাঁর সুরদান তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। আর এ গানটি সুর করার জন্যই তাঁকে জীবন দিতে হয়। একটি গানে সুর দেয়ার জন্য একজনকে জীবন দিতে হয়েছে এমন নজিরও বিরল। গানটির সুর গণসঙ্গীতের চরিত্র বহন করে। গানটির বাণী হচ্ছে: যারা ভাষা আন্দোলনে শহিদ হয়েছেন, তাঁদেরকে যে ভোলা যায় না, সে কথা আর যারা আমাদের ঘরে আঁধার নামিয়ে দিয়েছে, সে সব পশুদের ধিক্কার জানিয়ে প্রতিহত করার জন্য সকলকে মাঠেঘাটে সর্বত্র জাগতে বলেছেন। কারণ শহিদদের আত্মা আমাদের ডাকছে। কবি গানের বাণীতে উল্লেখ করেছেন, ইতিহাসের শেষ রায় হচ্ছে অত্যাচারীরা কখনো টিকে না। যারা কেড়ে নেয়, তারা হারে। সত্যি হলো, পাকিস্তানিরাও হেরেছে।

বাণীতে একই সঙ্গে শোক আর ক্ষোভ রয়েছে। সুরে এই ভাবটি রক্ষা করেছেন সুরকার। গানটি শুরু হয়েছে হারমিং দিয়ে–সমবেত কণ্ঠে স্বরের এই গ্রন্থনা সুরের একটি আবহ সৃষ্টি করেছে। মাত্র ৫/৬ টি স্বর টেনে টেনে সুরের যে বিনুনিটি সুরকার সৃষ্টি করেছেন, তা শোকের ইন্দ্রজাল তৈরি করেছে।

ভাই হারানোর যে কান্না আর কান্নার সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে অশ্রুবিন্দু পড়ার মতোই সুর যেন গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছে। সুরে কোন চাতুর্য নেই–আছে শোকাবহ পরিস্থিতি তুলে ধরার গাম্ভীর্য। আবার অন্তরাতে সুরের ধারায় পরিবর্তন এনেছেন। দাদরা তালের মন্থর গতি নেই। দ্রুত তালে দ্রোহের বাণীতে সুরও হয়েছে ক্ষিপ্র, দ্রোহী-জাগার তীব্র বাসনাকে তুলে ধরেছে। গানটি গাইতে গাইতে রক্তে আগুন জ্বলে।

এ সুর আমাদের উদ্দীপিত করে। রক্তে সংগ্রামী চেতনা ছড়িয়ে দেয়। সুরের ব্যাকরণ দিয়ে এ সুরের উৎকর্ষ ব্যাখ্যা করা যাবে না। সুরের বিন্যাসটি, তার স্বরপ্রয়োগের বিষয়টি একটি চেতনা থেকে উৎসারিত বলে তা এমন শক্তিশালী । এ কারণে বাংলা গানের ইতিহাসে, এমন গান দ্বিতীয়টি নেই বললেই চলে।

আমাদের সকলকে ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। ভাষাও বাড়িঘর, জমাজমির মতো দখল হয়ে যাচ্ছে। দখলদারদের কৌশল এতো চমৎকার ও লোভনীয় এবং ইউরোপ আমেরিকা থেকে পরকাল পর্যন্ত বিস্তৃত যে, তা আমরা অনেকেই বোঝতে পারি না। আমাদের বোঝতে হবে, আমাদের সংস্কৃতি আমাদের দাঁড়ানোর ভিত্তি। এর কোন বিকল্প নেই। অপসংস্কৃতি আমাদের অস্তিত্বকে বিনাশ করে। আমাদের সচেতনভাবে তা প্রতিরোধ করতে হবে। আমরা বাঙালি। আমরা পরাজিত নই। আমাদের ইতিহাস আমাদের রচনা করতেই হবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশাত্মবোধক গান

ধন-ধান্য-পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
ওসে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে-দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা কোথায় উজল এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে,
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে।
এমন দেশটি -----আমার জন্মভূমি ॥

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে,
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি-----আমার জন্মভূমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে, ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি-----আমার জন্মভূমি।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দু'টি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি।
এমন দেশটি-----আমার জন্মভূমি।

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের বসুন্ধরাঃ

এই গানটি বাংলা গানের পঞ্চকবির একজন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। দ্বিজেন্দলাল রায় সঙ্গীতাঙ্গনে ডি এল রায় নামে পরিচিত। তিনি আমাদের কাব্য সঙ্গীতের একজন সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল স্রষ্টা। একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার। নজরুলগীতি, লালনগীতির মতোই তাঁর গান স্বতন্ত্র সুরধারা, বুনন ও গায়কীর কারণে সুচিহ্নিত এবং 'দ্বিজেন্দ্রগীতি' নামে পরিচিত।

কবির ভাষাশৈলী যেমন কবিকে চিনতে সাহায্য করে, তেমনি কবি ভাষার মতোই গানের ভাবের, বিন্যাসের, সুরের সুচিন্তিত পরিচয় প্রকাশ পায়।

গানটিতে দেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে। কবির দৃষ্টিতে সমগ্র বসুন্ধরাটিই সুন্দর– ধনধান্য আর পুষ্পভরা। এই বসুন্ধরার মাঝে একটি দেশ আছে, সে দেশটি সকল দেশের সেরা, আর সে দেশ কবির জন্মভূমি বাংলাদেশ। এ দেশটি স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ দেশটি সকল দেশের রাণী। রাণীর মতোই সুন্দর, কমনীয় আর রূপের আধার।

এ দেশের চন্দ্রসূর্য উজ্জ্বল, নদী স্নিগ্ধ, পাহাড় ধূম্র, হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে থাকে আর ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস অপরূপ ছন্দে। গাছের শাখা ফুলে ফুলে ভরা, গুঞ্জরে অলি আসে, তারা ফুলের মধু খেয়ে ফুলের উপরই ঘুমিয়ে পড়ে। আর কুঞ্জে কুঞ্জে পাখি গায়। স্বস্তি ও প্রশান্তির এমন দেশ বিরল।

প্রকৃতির এই সৌন্দর্য মহিমামন্ডিত হয়েছে ভাইয়ের মায়ের অনিঃশেষ স্নেহ মমতার উপস্থিতিতে– যা আর কোথাও নেই। আমাদের এই প্রেম ভালোবাসা বাংলার নিজস্ব সম্পদ-আমাদের ঐতিহ্য। এখানে মাতৃপ্রেম আর স্বদেশপ্রেম একাকার।

গানটির সুরঃ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুরে পারিবারিক ঐতিহ্যের বাহকরূপে ধ্রুপদ ও খেয়ালের প্রভাব রয়েছে-ঠুমরি বা লোকধারার কোন প্রভাব নেই বললেই চলে। যদিও কয়েকটি কীর্তনাঙ্গের গান রয়েছে তাঁর। তিনি রাগরাগিণীর ওপর ভিত্তি করে গানের সুর করতেন। এ কারণে তাঁর একটি বিশ্বাস ছিলো যে, তাঁর গান হারিয়ে যাবে না। কারণ তাঁর গান তাঁর ভাষায় 'সুরে বাধা'।

এ গানটি কেদার রাগের ওপর ভিত্তি করে সুরারোপিত। তাঁর গানে মীড়ের ব্যবহার রয়েছে। তাঁর সুর বিস্তারধর্মী। তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন তাঁর কোন কোন সুরে, বা সুরের অতলে সে সঙ্গীতধারার ছোঁয়া পাওয়া যায়। এ গানটির সুরেও

আছে এক ধরনের আভিজাত্য। ধ্রুপদের প্রভাব ও দাদরা তালের কারণে গানটির চলন ধীর, গম্ভীর এবং শান্ত। একটি দৃপ্ত ভঙ্গি থাকলেও মাঝে মাঝে সুর কোমল ও নমনীয় হয়ে মনে রেখাপাত করে।

মুক্তিযুদ্ধের গান

গীতিকার : গোবিন্দ হালদার
সুরকার : সমর দাস
তাল : দাদরা

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল
জোয়ার এসেছে গণ সমুদ্রে
রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল
বাঁধন ছেঁড়ার হয়েছে কাল ॥

শোষণের দিন শেষ হয়ে আসে
অত্যাচারীরা কাঁপে আজ ত্রাসে
রক্তে আগুনে প্রতিরোধ গড়ে
রক্তে আগুনে প্রতিরোধ গড়ে
নয়া বাংলার নয়া সকাল-নয়া সকাল, নয়া সকাল ॥

আর দেরি নয় উড়াও নিশান
রক্তে বাজুক প্রলয়ের বিষাণ
বিদ্যুৎগতি হোক অভিযান, বিদ্যুৎগতি হোক অভিযান
ছিঁড়ে ফেল সব শত্রু জাল-শত্রু জাল শত্রু জাল ॥

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্তলাল:

এই গানটি আমাদের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় রচিত। গানটির গীতিকার গোবিন্দ হালদার আর সুরকার সমর দাস। গানটির পটভূমি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়।

যুদ্ধ চলছে। বাঙালি লড়ছে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর আমাদের পক্ষে মুষ্টিমেয় রাজাকার ছাড়া সমগ্র দেশের মানুষ। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দুর্ধর্ষ, অত্যন্ত চৌকষ এবং সারাবিশ্বেই বীর ও হিংস্র যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত। এই বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের বাঙালি জনগণ বিশেষত তরুণ-তরুণী, ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক সকলেই ভারতের স্বল্পদিনের প্রশিক্ষণে শুরু করে গেরিলা যুদ্ধ, চোরাগোপ্তা হামলা।

এ যুদ্ধের সময়কার একটি আশাজাগানিয়া গান আলোচ্য এই গানটি। গানটির বাণী সরল। পূর্বদিগন্তে সূর্য উঠেছে– রক্তলাল এই সূর্য। এই সূর্য প্রতীকী সূর্য। সূর্য স্বাধীনতার প্রতীক। সূর্য পূর্বদিগন্তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বোঝা যাচ্ছে সকালের আর বেশি দেরি নেই, আমাদের রাত শেষ হতে চলছে। অর্থাৎ পরাধীনতা, শোষণ ও অত্যাচারের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। গানটিতে গীতিকাব বলছেন:অত্যাচারীর দিন শেষ হয়ে আসছে। তারা ভয়ে আজ কাঁপছে। আমাদের জনগণ জেগে উঠেছে। আবালবৃদ্ধবণিতা মিলে জনতার যে বিশাল সমুদ্র–যেখানে আজ ঢেউ উঠেছে। 'রক্তে আগুন প্রতিরোধ গড়ে' চলছে। সুতরাং ভয় নেই। নতুন সকাল আসবেই। পতাকা উড়াও। রক্তে বেজে উঠুক প্রলয় বিষাণ। বিদ্যুৎ গতিতে অভিযান পরিচালিত হোক। শত্রুর সকল জাল ছিঁড়ে ফেলো। আমাদের সফলতা অনিবার্য। যুদ্ধজয়ের দৃঢ় আশা এ গানটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

গানটির গীতিকার গোবিন্দ হালদার পশ্চিম বঙ্গের একজন বাঙালি। বাঙালির ওপর নৃশংস অত্যাচারের খবরে কাতর হয়ে সেদিন সারাবিশ্বের বাঙালির মতো তিনিও হয়েছিলেন আমাদের সহযাত্রী-তিনিও ধারণ করেছিলেন আমাদের বেদনাকে, আমাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে। '৭১ সালে পৃথিবীর সকল বাঙালিই, এমনকি অনেক বিদেশিরা পর্যন্ত বিভিন্নভাবে যোগ দিয়েছিলেন মানবতারক্ষার পক্ষের এই যুদ্ধে। গোবিন্দ হালদার সে সময় কিছু গান লিখে দেন আমাদের। তিনি আমাদের ইতিহাসের অংশ হয়ে রইলেন। উল্লেখ্য, আমাদের ইতিহাসের অংশ হয়ে আছেন আরো অনেক বিদেশি শিল্পী।

গানটির সুর করেছেন প্রখ্যাত সুরকার সমর দাস। সমর দাসের জন্ম ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে। ঢাকার এই কৃতি সন্তান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক ও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। এ গানটি ছাড়াও আরো কয়েকটি মুক্তিযুদ্ধের গানের সুরকার তিনি। প্রচলিত সুর থেকে সুরারোপে তাঁর ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা হচ্ছে সুরে যুদ্ধগানের ব্যান্ড বা ব্যান্ডের তাল তিনি ব্যবহার করেছেন। ফলে গানটিতে যুদ্ধের একটি আবহ সৃষ্টি হয়েছে। সুরটিতে যে তাল, তা মার্চের তালের আঙ্গিক, লেফট রাইট, লেফট-রাইট সৈনিকের কুচকাওয়াজের মতো দীপ্ত ও দৃঢ় ভঙ্গিতে অনন্য।

যুদ্ধজয়ের একটি স্পিরিট তিনি সুরে আনতে পেরেছেন। বাণী যেন সুরের কারণে স্ফূলিঙ্গ হয়ে বের হয়ে এসেছে। গানটিতে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য রীতির বেহালার প্রতি তাঁর যে প্রীতি, তারও প্রকাশ আছে সুরারোপে।

স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার প্রেরণা হিসেবে এ গান আমাদের ইতিহাসের অংশ। এ গান যারা লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, গেয়েছেন, বাজিয়েছেন-স্বাধীনতার পর সরকার সকলকেই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মানিত করেছে। আমাদের এই গান ছিলো সেদিন অস্ত্রের মতোই গর্জে ওঠা হাতিয়ার। এ গান আমাদের অভয় দিয়েছে, সাহস দিয়েছে।

এ গান গাওয়ার সময় আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য মনে রাখতে হবে। স্বাধীনতার যে সূর্য আমরা পেয়েছি, যে নয়াসকাল আমাদের পূর্বসূরিগণ এনে দিয়েছেন, তার পেছনে আছে লাখো শহিদের রক্ত, লাখো মা বোনের সম্ভ্রম হারানোর বেদনা। এ কথাগুলো এ প্রজন্মের সন্তানদের মনে রাখতে হবে। ইহিহাস ভুলে গেলে ভবিষ্যৎ থাকে না। তোমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তোমরাই বহন করবে দেশের সম্মান।

নজরুল সঙ্গীত

রাগ : হেমকল্যাণ, তাল : দাদ্‌রা

দাও শৌর্য, দাও ধৈর্য্য, হে উদার নাথ,
দাও প্রাণ।

দাও আমৃত মৃত জনে,
দাও ভীত-চিত জনে, শক্তি অপরিমাণ।
হে সর্বশক্তিমান ॥

দাও স্বাস্থ্য, দাও আয়ু,
স্বচ্ছ আলো, মুক্ত বায়ু,
দাও চিত্ত অ-নিরুদ্ধ, দাও শুদ্ধ জ্ঞান।
হে সর্বশক্তিমান ॥

দাও দেহে দিব্য কান্তি,
দাও দেহে নিত্য শান্তি,
দাও পুণ্য প্রেম ভক্তি, মঙ্গল কল্যাণ।
ভীত নিষেধের ঊর্ধে স্থির,
রহি যেন চির-উন্নত শির
যাহা চাই যেন জয় করে পাই, গ্রহণ না করি দান।

হে সর্বশক্তিমান ॥

নজরুলের গান: দাও শৌর্য, দাও ধৈর্য....

নজরুলের এ গানটি হেম কল্যাণ রাগে দাদরা তালে রূপায়িত। এ গানটি নজরুলের ভক্তিমূলক পর্যায়ের গান। নজরুল মানুষের কবি। মানুষের মুক্তি তাঁর সারা জীবনের আরাধ্য। নজরুলের ভক্তির গানে একটি ব্যতিক্রম লক্ষণ হচ্ছে: বেশির ভাগ সময়েই তিনি যখন ভক্তিতে প্রণত হয়েছেন, তখনও আধ্যাত্মমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জাতির বা দূর্বলের মুক্তি কামনা করেছেন। তাঁর হামদ, নাত ইত্যাদিতে এই সত্য লক্ষ করার মতো। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বোঝা সম্ভব। 'এলো ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী/ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি।' (তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোল) নবীর আগমনবার্তা নিয়ে যে নাত সেখানেও ব্যথিত মানবের কথা, তাদের মুক্তির

সম্ভাবনার কারণেই নবীর আগমন বার্তার আনন্দ দ্বিমাত্রিক হয়ে ওঠেছে। এ গানে কবি স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করেছেন। অত্যন্ত সহজ, সরল কিছু চাওয়া। একটি সরল সত্যকে এখানে বোঝতে হবে: যার যা নেই, তাই সে প্রার্থনা করে। আমাদের মধ্যেও ঐ সরল সাধারণ চাওয়াগুলিই ছিলো না, হয়তো আজো আমরা তা অর্জন করতে পারিনি। জাতীয় কবি আমাদের জাতির সার্বিক অবস্থাটি জানতেন-ভালো করেই জানতেন। কবি স্রষ্টার কাছে শৌর্য, বীর্য চেয়েছেন; স্বাস্থ্য চেয়েছেন, আয়ূ চেয়েছেন, মুক্ত বায়ূ চেয়েছেন–চেয়েছেন শক্তি সাহস, দেহের দিব্যকান্তি, গৃহে নিত্য শান্তি আর চেয়েছেন শুদ্ধ জ্ঞান। এই 'শুদ্ধজ্ঞান' চাওয়ার কথাটি লক্ষ করার মতো। কারণ শুদ্ধজ্ঞান থাকলেই শুদ্ধজীবন নির্বাহ সম্ভব। শুদ্ধজ্ঞানের কোন বিকল্প নেই– এ কথা আজ প্রমাণিত সত্য। আমাদের মনে রাখতে হবে, শুদ্ধের পাশেই অশুদ্ধ থাকে। অশুদ্ধও দেখতে শুদ্ধের মতো। কোন কোন ক্ষেত্রে অশুদ্ধকেই বেশি সুন্দর লাগে। নকল বলে তার কৃত্রিমতা ও চাকচিক্য দেখে আমরা ভুল করি। ফলে আমরা মাঝে মাঝে শুদ্ধকে চিনে নিতে পারি না। মনে রাখতে হবে, সত্য মানুষের জীবনে একটি বড় ঐশ্বর্য। তা শুদ্ধজ্ঞান ছাড়া আসে না। নজরুল প্রার্থনা করেছেন পুণ্য, প্রেমভক্তির। এই ভাবগুলোর শেকড় ধর্মের গভীরে স্থাপিত। নজরুলের কাছে ধর্ম হচ্ছে সুন্দরের সাধনা। ধর্ম মানুষকে সুন্দর বলেই ধর্ম সুন্দর। ধর্ম যে সততার শিক্ষা দেয়, তাই আসলে পরিণামে কল্যাণ নিয়ে আসে। সত্য, মঙ্গল ও পুণ্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এক মহত্তর বোধে উন্নীত করে। কবির প্রার্থনা, বিধিনিষেধের কাছে মাথা নত না করে শির যেন চির উন্নত থাকে । বিধিনিষেধের বেড়াজালে বন্দী হয়ে থাকার প্রবণতা আসলে এক ধরনের রক্ষণশীলতা-যা কবি সারাজীবন দূর করতে চেয়েছেন। আর 'চির উন্নত শির' কবি নজরুলের আত্মমর্যাদার একটি চিহ্ন।

কবি ভক্ত হলেও ভক্তের জন্য রক্ষিত দান, তা গ্রহণ করতে আগ্রহী নন। কারণ দান গ্রহণে সম্মান নেই–অর্জনে সম্মান। দান গ্রহণ দীনতার পরিচয় বহন করে আর জয় করে অর্জন আত্মমর্যাদা ও গৌরবের পরিচয় নির্দেশ করে। কবি স্রষ্টার কাছে চেয়েছেন জয় করে পাওয়ার শক্তি। নজরুল বাঙালিকে দেখতে চেয়েছেন বীরের জাতি হিসেবে। বীর ক্ষুদ্রতা ও দীনতা হতে নিজেকে রক্ষা করে চলেন। এ কারণেই এ গান আমাদের মাঝে তুলনাহীন ঐশ্বর্যের একটি বোধ সৃষ্টি করে। এ গান আমাদের বীর হতে বলে, আদর্শ হতে বলে, মহৎ হতে বলে-রূপে ও গুণে অনন্য হতে বলে ।

এ গানটি এখনো প্রাসঙ্গিক। আজ আমরা সবই হারাতে বসেছি। যা অর্জন করেছিলাম, তাও যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের স্বাস্থ্য নেই, আয়ূ নেই, প্রেমভক্তি নেই–নেই পুণ্য, শুদ্ধ ও সত্য জ্ঞান। এ সকল আমাদের জন্য আজ জরুরী। মুক্ত বায়ূ না থাকলে স্বাস্থ্য থাকে না, আয়ূও বাড়ে না। শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে ধৈর্য না থাকলে মানুষ সফল হয় না। ধৈর্য অসাধারণ একটি গুণ। ধৈর্য একান্তভাবে প্রয়োজন আমাদের

আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য, লক্ষে পৌঁছার জন্য।

গানের সুরটি সরল, অনেকটা একহারা গোছের হলেও অসাধারণভাবে প্রার্থনার ভাবটি রূপ লাভ করেছে। গানটি গাইতে গাইতে, এই প্রার্থনার ভাবটি একটি তৃপ্তিদায়ক শুভ্রচেতনার জন্ম দেয় আমাদের অন্তরলোকে। উদারনাথের কাছে প্রার্থনার সময় আমাদের মনও উদারতায় ভরে যায়। উন্নতভাব ও নৈতিক বৃত্তির সঙ্গে এ গানের সম্পর্ক আছে বলে এ গান মহৎ। উন্নতভাব সকল সময়ই নৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করে। ভক্তিমূলক বলে প্রশান্তির সঙ্গে , তার কোমল ভাবরসের সঙ্গে উন্নত শিরে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর প্রার্থনা আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। আমরা ভক্তিরসের গানে বীররসে উজ্জীবিত হই। এখানেই নজরুলের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

প্রত্যেকটি আন্তরিক প্রার্থনাই ঈশ্বর কবুল করেন-বলেছেন যিশু। এ গান হোক আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা-অনুভূতি দিয়ে পরিবেশন। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের প্রচেষ্টাতেই সত্য আসবে, স্বাচ্ছন্দ্য আসবে।

রবীন্দ্র সঙ্গীত

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর ॥
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগনমাঝে,
বিশ্বজৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে॥
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে॥
ধরণী পর ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা
ফুলপল্লব-গীতগন্ধ-সুন্দর-বরণে॥
বহে জীবন রজনীদিন চিরনূতনধারা ॥
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে ॥
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ
কত সান্ত্বন করো বর্ষণ সন্তাপহরণে ॥
জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে ॥

'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানটি ১৮৯৩ সালে রচিত হয়। মানুষের জীবন ও মরণে, নতুনের আগমনে ও জীবনের প্রবহমানতায় ঈশ্বরের পরম কৃপা ও ভালোবাসার কথা গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে। সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের উপস্থিতি ধরণীকে আনন্দলোকে পরিণত করেছে। গানের বাণীতে আধ্যাত্মবাদের যে মহিমান্বিত উপস্থিতি রয়েছে তা আত্মা ও মনকে আত্মশুদ্ধির পথে নিয়ে যায়, পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে মানুষকে। গভীর দুঃখে সান্ত্বনার বাণীপূর্ণ এই গানটিকে তাই অনেকে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবে গেয়ে থাকে।

লালন গীতি

সত্য বল্ সুপথে চল্ ওরে আমার মন
সত্য সুপথ না চিনিলে পাবে না মানুষের দরশন ॥

খরিদদার মহাজনে যে জন
ও তার বাট্‌খারাতে কম
তারে কসুর করবে যম,
গদিয়ান মহাজন যে জন
বসে কেনে প্রেম-রতন ॥

পরের দ্রব্য পরের নারী
হরণ করো না
পারে যেতে পারবে না
যতোবার করিবে হরণ
(তোমার) ততোবার হবে জনম ॥

লালন ফকির আসলে মিথ্যে ঘুরে বেড়ায় তীর্থে তীর্থে,
সই হলো না এক মন দিতে
আসলেতে প'ল কম ॥

লালনের গান: সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন।

এ গানটি ফকির লালন শাহের। লালন বাউল সম্রাট। লালন পৃথিবীর অন্যতম প্রভাববিস্তারকারী মরমি সাধক ও সঙ্গীতস্রষ্টা। তিনি কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় আশ্রম গড়ে সেখানেই সাধনা করেন। তাঁর সাধনার স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর গানে। গানে গানে নিজের কথা বলে গিয়েছেন। তিনি নিরক্ষর। কিন্তু তাঁর গান নিয়ে আজ সারাবিশ্বেই গবেষণা হচ্ছে। লালন বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। তাঁর বড় কীর্তি তাঁর গান। আর সে গান মরমের কথা। তিনি অসাম্প্রদায়িক, জাতের নামে মানুষে মানুষে যে বিভাজন, তিনি মানেন নি। তিনি মানুষকে বড় মনে করেছেন। মানুষের জন্য শাস্ত্র বা ধর্ম। ধর্মের জন্য মানুষ নয়। যারা মানুষকে অবজ্ঞা করে ধর্মকে বড় মনে করে, লালন শাহ তাদের অসারতা তুলে ধরেছেন যুক্তি দিয়ে।

এ গানটিতে লালন মানুষকে সত্য ও সুপথে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ সত্য ও সুপথ ছাড়া আমাদের মুক্তি সম্ভব নয়। এমন কথা শুধু লালনের নয়–পৃথিবীর সকল প্রান্তের সকল মানুষই বলেছেন। লালন বলেন:

'সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন
সত্য সুপথ না চিনলে পাবি না মানুষের দরশন।'

প্রশ্ন: কোন্ মানুষ?

যে মানুষ শুদ্ধ, যে মানুষ পূর্ণাঙ্গ, যে মানুষ কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে শুদ্ধ হয়ে লীন হয়েছেন পরমের সাথে বা স্রষ্টার সাথে। পরমসত্তা সত্য, শুদ্ধ তথা পবিত্র। সুতরাং কেউ পরমের সাথে মিলিত হতে চাইলে তাকে শুদ্ধ হতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। কারণ স্রষ্টা অন্য কোন পথ রাখেননি। যে ভাবেই বলি না কেন, স্রষ্টা পবিত্র, তিনি সত্য, তিনি সুন্দর। আর শুদ্ধ না হলে তাঁর দরশন সম্ভব নয়।

লালনসহ পৃথিবীর আরো অনেক মরমিসাধকই মনে করেন, স্রষ্টা মানুষের মাঝে রয়েছেন। তিনি মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা প্যাগোটায় নেই। কোরান ও বাইবেল ধর্মগ্রন্থে আছে: আল্লাহ মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টির পর নিজের 'রুহ' তাতে ফুঁকে দেন। (দ্রষ্টব্য: পবিত্র কোরান সুরা সাদ ৩৮:৭১-৭৪, সুরা হিজর ১৫:২৯, সুরা সিজদা ৩২: ৯) এই রুহ সঞ্চার বা ফুঁকে দেওয়ার পরই মাটির মানুষ স্বরূপে প্রকাশিত হলো। তাই এই রুহ বা আত্মা হচ্ছে স্রষ্টার অংশ, স্রষ্টার প্রকাশ, পরম সত্তার শক্তি, অভিভাজ্য সত্তা, মানুষের মৌলিক সত্তা। এই সত্তাটি থাকলেই আমি থাকি, না থাকলে আমি থাকি না। লালন এ কারণে লিখেছেন: 'আত্মারূপে কর্তা হরি' বা 'এ মানুষে আছে মানুষ রতন'। যিনি এই আত্মার স্বরূপ জানেন এবং সাধনার দ্বারা সত্যে উপনীত হয়েছেন বা লীন হয়েছেন, তিনিই যথার্থ মানুষ। আসলে সমস্ত মিথ্যা, কালিমা ত্যাগ করে যিনি সত্যকে, কেবল সত্যকে ধারণ করেন, তিনিই পরিণামে হয়ে যান সত্যের আকর, তার চেহারাই হয়ে যায় পরমের চেহারা। তার হস্তপদ সবকিছুই পরমেরই হয়ে যায়। বাইরে থেকে যে মানুষটি দেখি, তখন তিনি আর সে মানুষটি থাকেন না। তিনি তখন পরশপাথর। তাঁর স্পর্শেই লোহা সোনা হয়ে যায়। এমন মানুষই সাধকের, জ্ঞানীর আরাধ্য। এমন মানুষের দরশন পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

প্রথম অন্তরায় তিনি বলেন:

সকল ব্যবসায়ীরাই এক রকম নয়। কোন কোন ব্যবসায়ী ফড়িয়া–ঘুরে ঘুরে জিনিস কেনে এবং বেঁচে। তারা ওজনে গরমিল করে। তারা যমের হাত থেকে অর্থাৎ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে না। আবার কোন কোন ব্যবসায়ী গদিয়ান মহাজন-তারা গদিতে বসেই মালামাল ক্রয়বিক্রয় করে। তারা সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ে দেন না।

তারা ঘরে বসেই প্রেমের লেনদেন করে। তারা লাভবান।

দ্বিতীয় অন্তরায় তিনি একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। এখানে লালনের মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। লালন জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জন্মান্তরবাদ হচ্ছে: আমি এ জনমে যদি ভালো কিছু করি, তবে ভালো রূপে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসব আর যদি মানুষ হয়ে পশুর আচরণ করি, তবে পশু হয়ে ফিরে আসব। এই মতবাদটি পৃথিবীর অনেক ধর্মের অনেক মানুষ মনে করে-কেউ প্রকাশ্যে, কেউ গোপনে গোপনে বিশ্বাস করে। লালন বলেন:

'পরের নারী পরের দ্রব্য হরণ করো না, পারে যেতে পারবে না
যতোবার করিবে হরণ ততোবার হবে জনম।'

লালন সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, এমন অপকর্ম করো না। করলে তোমাকে বার বার পৃথিবীতে এসে নিগৃহীত হয়ে পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই হরণ-যা অন্যায্য বা অন্যায়, তা আসলে সরল অর্থে মানুষের মনের চাওয়া, সাধুশাস্ত্রে যাকে বলে নফস বা প্রবৃত্তি। লালন বলেন, এই প্রবৃত্তিই মানুষের শত্রু। প্রবৃত্তি তুফানের মতো আন্দোলিত করে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। মানুষ এখানে স্থির থাকতে পারে না। প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ সাধনার একটি বড় অংশ। লালন এখানে মানুষকে সাবধান হতে বলেছেন।

তৃতীয় অন্তরায় এসে তাই তিনি বলেন: মানুষের মনই আসল।

মন যে সকল প্রচেষ্টা বা সাধনার মূল- এ সত্যটি লালন স্পষ্ট করে বলেছেন। লালন তাই মনকে স্থির করতে বলেছেন। তীর্থে তীর্থে ঘুরে কোন লাভ নেই। আমরা মন স্থির না করে মক্কা মদিনা, গয়া কাশি যাই, তাতে বিশেষ কোন লাভ হয় না। তীর্থদর্শনের পরেও আমাদের কোন পরিবর্তন হয় না, আগের মতোই সমানতালে পাপ, অন্যায় করে থাকি। সমাজ এমন তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে তেমন ভালো কিছু পায় না। তাই আগে মনকে ঠিক করতে হবে। কারণ মন ঠিক না হলে কর্ম ঠিক হয় না। মনের কারণেই সত্য ও সুপথের বিপরীতে আমরা কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্যকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। মন জটিল, বহুভঙ্গিম; সে বাগ মানে না, সে নিজেরটা পেয়ে-খেয়েই তৃপ্ত থাকে না। সে নিজেরটা খেয়ে 'আইল ডিঙিয়ে' অন্যেরটা খেতে চায়। এই প্রবণতা সত্য ও সুপথের অন্তরায়। এ গুলো ত্যাগ করতে বলেছেন লালন। এ গুলো ভোগবাসনার পথ, দলাদলি ও সংকীর্ণতার পথ। জীবনে এ গুলো স্থান দিলে মানুষের আত্মিক বিকাশ সম্ভব হয় না, মানবিকতার উন্নয়ন ঘটে না। সঙ্গতকারণেই মিথ্যার সহযাত্রী হয়ে বা বাহক হয়ে সত্যরূপী স্রষ্টার দরশন পাওয়া সম্ভব নয়। লালনের কাছে সত্য কেবলই সত্য এবং কঠিন সাধনার বিষয়। এ কারণেই প্রথমে বলেছেন, বাটখারাতে কম দিলে যমে কখনো কসুর করবে না। আমরা সত্যকে যে

বুঝি না, তা নয় কিন্তু সত্য বোঝলেও সত্যকে ধারণ করতে পারি না। ধারণ করার জন্য যে ত্যাগ ও সাধনা দরকার, তা আয়ত্তে আনি না। অধিকাংশ সময়ই আমরা দোলাচলবৃত্তিতে থাকি। বস্তুত দু'মনা হয়ে সাধনা হয় না। সাধনার জন্য একমনা হতে হয়। একমনাই একাগ্রতা। মন একীভূত না হলে সত্য অনুভবে আসে না। অনুভব ছাড়া সাধনা বা ইবাদতের মূল্য অত্যন্ত সামান্য। অনুভবের মাধ্যমেই স্রষ্টাকে বা সত্যকে জানা যায়। এই অনুভব আসে শুদ্ধতার ফলে। শুদ্ধতাই পবিত্রতা। শুদ্ধতাই পরমসত্তা। শুদ্ধ না হলে শুদ্ধ সত্তার দরশন সম্ভব নয়। লালন গুরুবাদী। লালন গুরুর কাছ থেকে সত্য জেনে, গুরুর সান্নিধ্যে সাধনা করে সত্যে বিলীন হতে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

সৃজনশীল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা-১০০০